11 MAY 2017

‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর, বেদনার বালুচরে’

সাথী খালকো

আগামী ১৭ মে, ২০১৭ইং তারিখ বুধবার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের শাপলা অডিটরিয়ামে সমতলের আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধাবৃত্তির টাকা বিতরণের ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে এ বৃত্তির টাকা তুলে দিবেন। বিষয়টি রোমাঞ্চের, উচ্ছ্বাসের এবং গর্বেরও। কারণ এত এত সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একই অডিটরিয়ামে বসে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কুশল বিনিময়, অভাব, অভিযোগের সুযোগও হয়ত কেউ কেউ কাজে লাগাতে পারেন। লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিগৃহীতের কথাও কেউ কেউ বলতে পারেন আবেগে। যারা উপস্থিত থাকছেন তারা সৌভাগ্যবান/ সৌভাগ্যবতীই বলা যায়। আর যারা নানা কারণে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের তো আফসোসের অন্ত নেই। যেসব কথার আকুলি বিকুলি অনুরণন হচ্ছে মন-মগজে সেসব কথা শোনার শ্রোতা কই? কেউ কি শুনবে সেসব কথা উত্তম শ্রোতার মতো! নাই শুনুক! আজ আমার কথা বলব সবার উদ্দেশ্যেই। শুনুন তবে.....ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স থেকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে অনেকে তাদের শিক্ষার স্তরটাকে স্বাভাবিক ভাবে শেষ করতে পারবেন স্বচ্ছন্দে, যথাসময়ে এ আশাবাদ সবার। এ বৃত্তি পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন/ হবেন অস্বচ্ছল, গরিব, মেধাবী শিক্ষার্থীরা। গতবারও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা মিলনায়তনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির টাকা তুলে দিয়েছিলেন, যা আদিবাসীদের কাছে পরম পাওয়া বলেই বিবেচিত। সমতলের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একসাথে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এসে সমবেত হওয়াটা বিরলও বটে। এযেন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মিলন মেলা। আবেগে আপ্লুত হয়ে অনেককেই উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দাশ্রু ঝরাতে দেখেছি। এর উল্টোটাও নজর এড়াইনি অনেকের। যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের দুঃখের সীমাটাও দীর্ঘ। বিশেষ করে বৃত্তি পাবার সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা বঞ্চিত হয়েছেন অজানা কারণে। বাস্তবে দেখা গেছে যে যারা পড়ালেখার পাঠ চুকিয়েছেন অনেক আগেই, তারাও বৃত্তির ষোল আনা টাকা তুলেছেন বঞ্চিতদের সামনে। পড়ালেখা বাদ দিয়ে যারা বিয়েসাদি করে দিব্যি সন্তানাদি নিয়ে ঘর সংসার করছেন তারাও দেখি এ তালিকায়! ভুলবশত তো নয়ই বরং আগে থেকেই রীতিমতো ‘কনফার্মেশন’ করেই তারা অর্থপ্রাপ্তির কথা ফলাও করে প্রচার করেন বুক চেতিয়ে। এটাও কি সম্ভব? যারা বাছাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা বেশ স্বচ্ছতার সঙ্গেই যাচাই বাছাই করেই শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করেন বলেই বিশ্বাস। কিন্তু যখন একই শিক্ষার্থী প্রতিবছর বৃত্তি পেতে থাকেন পড়াশুনা শেষ করার পরও তখনই সন্দেহ জাগে। তবে কি এক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়! একই পরিবার থেকে একাধিক শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা বাগিয়ে নিতেও দেখা গেছে। আদিবাসী নয় এমন শিক্ষার্থীরও বৃত্তির টাকা থাবার নজির রয়েছে। একাধিক প্রার্থীর নাম দুইবার লেখা হয়েছে কি অবচেতনভাবে? বিশ্বাস হয় না। কারণ দীর্ঘ সময় নিয়ে মাত্র ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করেও এই ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়? অনভিপ্রেত, কাকতালীয় বুঝি! হলোই বা, তাতে করে প্রকৃত সংখ্যাটা কমবে নিশ্চয়। কিন্তু ৩৫০ জন পূরণ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা এখন অবধি জানান হয়নি। যাদের নাম দুইবার এসেছে তারা কি দুইবার করে টাকা তুলবেন? নাকি রেখে দেয়া হবে! এ টাকাটা তাহলে যাবে কার পকেটে? এতে করে কি বঞ্চিতরা আরো বেশি কষ্ট পাবেন না?

আবেদনপত্র পাঠানোর সময়সীমা সম্পর্কে দৃশ্যমান কোনো নোটিশ চোখে পড়েনি এর আগেও। লোকমুখে শুনে শুনে দরখাস্ত করে টাকা পাবার আশায় থেকে থেকে যখন তারা সংসার বা কর্মক্ষেত্রে থিতু হয়ে যান তখনই বৃত্তি প্রদানের খবর পান। বঞ্চিতরা ‘প্রহসন’ বলে কষ্ট পান। ক্ষোভে অনেককে গালমন্দ করতে শুনেছি। অনেক অভিভাবক এটা সরকারের লোভ দেখানো ‘তামাশা’ বলে অভিহিত করেছেন। এর ব্যাখ্যায় তারা জানিয়েছেন যে অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই বৃত্তি পান? বৃত্তিপ্রাপ্তদের থেকেও মেধাবীরা যখন বাদ পড়ে যান তখন তাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের দরকার পড়ে না। ঠিক কী কারণে বিশেষ এলাকা, প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ জাতির শিক্ষার্থীরা তালিকায় লম্বা জায়গা জুড়ে অধিকার কায়েম করেছেন তাও বোধগম্য নয়। একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের অর্থ সেই অর্থ বছরেই বন্টন করার কথা অথচ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো খবর পায় না আশায় দিনগোনা শিক্ষার্থীরা। দেখা যায় যে দুই অর্থবছরের টাকা একবার বিতরণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন কর্তাব্যক্তিরা। সরকারের যে ‘পে-ইনল্যান্ড পোর্টালে’ যেভাবে এবারের বৃত্তির খবরটি দেয়া হয়েছে সেটাতেই যদি যথাসময়ে আবেদনের আহ্বান জানিয়ে নোটিশ দেয়া হয় তবে আর কারো কাছে জবাবদিহিতার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি বছর যেন অর্থবছর শুরুর কয়েক মাসের মধ্যে দরখাস্ত করার সময় সীমা জানিয়ে দেয়া হয়। আবার-আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে সেই অর্থবছরেই যেন বৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করে দরখাস্ত করার নির্দেশনা দেয়া হলে ঝরে পড়ারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয় মেধার ভিত্তিতে মেধাবৃত্তি দেয়ার বিধান অনুসরণ করলে প্রকৃত শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবে। অবশ্য আঞ্চলিক কোটা সংরক্ষণ করাটা বাঞ্ছনীয় হবে। যেসব জাতিসত্তার জনসংখ্যা কম এবং যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

আমার আরো একটা পরামর্শ হলো শিক্ষার্থীদের যাচাই বাছাই কাজে যেন সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর এমন কোন ব্যক্তিকে রাখা হয় যিনি বিষয়টির স্বচ্ছতা প্রতিপাদনে ন্যায়নীতিনিষ্ঠ হন। মনে পড়ে গেল একটি প্রবাদ। হয়তো প্রাসঙ্গিক, সেটি হলো: ‘কুটুমের নামে মেরে হাস, গোষ্ঠীসুদ্ধ খাস মাস!’ আত্মীয় স্বজনদের খেদমত করায় বাহবা জুটলেও এক্ষেত্রে কিন্তু তিরস্কারই প্রাপ্য। আমার মতো যারা আশাহত হয়েছেন তাদের অধিকাংশের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। স্বভাবতই তাদের মর্মে বাজে ‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর, বেদনার বালুচরে’!

[লেখক: শিক্ষার্থী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়]